স্কাই-ফাই : ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ

বেশ কিছু কোম্পানির সুদৃঢ় প্রত্যাশা– একদিন এরা স্যাটেলাইট, ড্রোন ও বেলুন ব্যবহার করে ইন্টারনেটকে পৌঁছাবে সেইসব পিছিয়ে পড়া মানুষের দুয়ারে, যারা এখনও থেকে গেছে ইন্টারনেট থেকে বিচ্ছিন্ন। এভাবেই এরা বিশ্বজুড়ে ঘটাতে চায় ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ। এরই ওপর আলোকপাত রয়েছে এ প্রতিবেদনে। লিখেছেন গোলাপ মুনীর।

১৯৯০-এর দশকে ইন্টারনেট বেরিয়ে আসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসের বাইরে। ইন্টারনেটের প্রবেশ ঘটল সাধারণ্যে। সাধারণ মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠল ইন্টারনেট ব্যবহারে। সেই থেকে মানুষ ইন্টারনেটকে গ্রহণ করল এক আশীর্বাদ হিসেবে। আর সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়তে লাগল ইন্টারনেটের ব্যবহার। ১৯৯৭ সালে আমরা দেখলাম, বিশ্বে অনলাইন পপুলেশনের হার মাত্র ২ শতাংশ। ২০১৪ সাল শেষে সেই হার উঠে এলো ৩৯ শতাংশে। সংখ্যার হিসেবে বিশ্বের তিন কোটি মানুষ ব্যবহার করছে ইন্টারনেট (চার্ট দেখুন)। তথ্যপ্রযুক্তির ভাষায় এরা নেটিজেন। এরই মধ্যে ২০১৫ সালেরও আরও চারটি মাস পেরিয়ে গেছে। এই কয় মাসে নিশ্চয় এই নেটিজেনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে গেছে। কিন্তু এরপরও বিশ্বে এখনও ৪০০ কোটির মতো মানুষ রয়ে গেছে ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এরা বসবাস করছে ইন্টারনেটহীন দুনিয়ায়। এই ইন্টারনেট বঞ্চিতদের বেশিরভাগেরই বসবাস উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। উন্নয়নশীল বিশ্বের মাত্র ৩২ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, যখন উন্নত বিশ্বের ৭২ শতাংশ মানুষ পাচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ। আবার উন্নয়নশীল বিশ্বের সব দেশে সমান হারে ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে না। ২০১৪ সালের হিসাব মতে, আফ্রিকার মাত্র ১৯ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। বেশিরভাগ অবকাঠামোর মতো ইন্টারনেট সুবিধা শহর এলাকায় সবচেয়ে সহজে জোগান দেয়া যায়। পল্লী এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী, এমনকি ধনী দেশগুলোর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীরও জীবন-যাপন চলছে ইন্টারনেট সংযোগের বাইরে থেকেই।

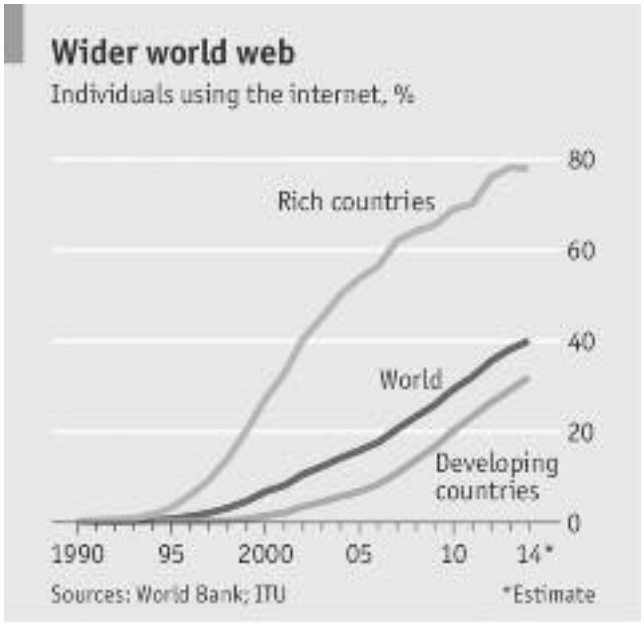

এরপরও এ অবস্থার পরিবর্তন প্রায় সমাগত বলেই মনে হচ্ছে। চারটি প্রযুক্তি কোম্পানি হাতে নিয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, এসব কোম্পানি বিশ্বের প্রায় সব মানুষকে জোগান দিতে পারবে উচ্চমানের দ্রুতগতির ইন্টারনেট কানেকশন। গুগলের স্বপ্ন– এমনই কিছু করা। আর গুগল তা করতে চায় বিশ্বজুড়ে ঘুরে বেড়ানোর মতো একদল হিলিয়াম বেলুন ওড়ানোর মধ্য দিয়ে। ফেসবুকের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন সৌরশক্তি চালিত একটি বিমানবহর, যা হবে কার্যত একটি ড্রোন বিমানবহর। আর রকেট প্রস্তুতকারক কোম্পানি 'স্পেসএক্স' ও ফ্লোরিডার নতুন কোম্পানি 'ওয়ানওয়েব' লক্ষ্য স্থির করেছে একঝাঁক সস্তা, কম উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়ার উড়ন্ত উপগ্রহ তথা ফ্লাইং স্যাটেলাইট চালুর। সর্বব্যাপী ইন্টারনেট রুট সৃষ্টি করে এরা স্থানীয় টেলিকম প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগাবে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা জোগাতে। কিংবা শহর থেকে অনেক দূরে থাকা এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা জোগাতে এরা ব্যবহার করবে তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোন।

এই টপ-ডাউন উদ্যোগ এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, সুপরিচিত টেরিস্ট্রিয়াল টেকনোলজি যথেষ্ট উপযোগী নয় গোটা বিশ্বে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা জোগাতে। ধনী শহরগুলোতে সাধারণত যেভাবে তারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়, সেভাবে বিশ্বের প্রতিটি বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়াটা নিশ্চিতভাবেই হবে ব্যয়বহুল। মোবাইল ফোনের টাওয়ারগুলো আমাদের তার সংযোগ থেকে দূরে রাখে। কিন্তু এসব টাওয়ারে এখনও প্রয়োজন হয় ইন্টারনেটের হাই-ব্যান্ডউইডথের কানেকশন ব্যাকহাওলের। উপগ্রহ যোগাযোগে ব্যাকহাওল শব্দটি ব্যবহার হয় একটি পয়েন্টে ডাটা আনার ক্ষেত্রে, যেখান থেকে এই ডাটা একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণ করা যাবে। এই হাই-ব্যান্ডউইডথের ব্যাকহাওলের প্রয়োজন হয় বলেই এখনও দ্রুত মোবাইল নেটওয়ার্ক সর্বব্যাপী হতে পারেনি। ধনী দেশের গ্রাম এলাকাগুলোও এই সর্বব্যাপী ইন্টারনেট কানেকশন থেকে রয়েছে দূরে। আর গরিব দেশের গ্রামের মানুষ তো এর নামই শুনেনি।

তা সত্ত্বেও একটি উপগ্রহ পৃথিবীর পৃষ্ঠের বিরাট অংশ দেখতে পারে। উপগ্রহ থেকেও তা দেখা সম্ভব। তাত্ত্বিকভাবে তা সুযোগ দেয় একসাথে লাখো-কোটি মানুষকে ডাটা সরবরাহ করার। আর স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সার্ভিস ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে পাওয়া যাচ্ছে। তবে দামটা থেকে গেছে বেশিই। ব্যান্ডউইডথও সীমিত, আর ডাটাও পাওয়া যায় ছোট আকারের। এখন জিওস্টেশনারি অরবিটে অবস্থান করছে অনেক কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট। এগুলো রয়েছে পৃথিবী থেকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার ওপরে। এগুলো পৃথিবীর কোনো স্থির বিন্দুর ঠিক উপরে অবস্থান করছে। এর রয়েছে দু'টি অপরিহার্য অসুবিধা। দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এর রেডিও সিগন্যাল নেমে যায় দ্রুত। অতএব এগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখতে প্রয়োজন সবল ট্রান্সমিটার ও ভালো মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা। দ্বিতীয় সমস্যার নাম ল্যাটেন্সি। এটি হচ্ছে সিগন্যালের একটি বিলম্বতা। একটি রিকুয়েস্টের বেলায় কমপক্ষে নিতে পারে আধা সেকেন্ড। ধরুন, একটি ওয়েবপেজ ভূমি থেকে স্যাটেলাইট পর্যন্ত যেতে এবং আবার সেখান থেকে ফিরে আসতে, আবার পেজটি উল্টোপথে একই সফর সম্পন্ন করতে এই সময় লাগে। শুনতে এটি খুব একটা বেশি সময় বলে মনে হয় না। কিন্তু তারযুক্ত কানেকশনের বেলায় এটি অন্যান্য ইন্টারনেট ল্যাটেন্সির তুলনায় এক-দশমাংশ বা তার চেয়েও কম।

উপগ্রহ থাকবে আরও নিচে

মি. উইলারের প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা করছে ৬৪৮টি ছোট ও তুলনামূলকভাবে সরল উপগ্রহ ১২০০ কিলোমিটারের চেয়েও নিচু কক্ষপথে নিক্ষেপ করার। এ ক্ষেত্রেও ল্যাটেন্সি হবে ▸

ফিক্সড-লাইন কানেকশনের সমান। আর এর ফলে ভূমিতে ব্যবহার করা যাবে আরও কম ক্ষমতার অ্যারিয়েল। 'ওয়ানওয়েব'-এর সেবা দেবে এয়ারলাইন ও সামরিক গ্রাহকদের এবং সেই সাথে ইমার্জেন্সি সার্ভিস ও দুর্যোগের সময়ে ত্রাণ সরবরাহকারী সংগঠনগুলোকেও, যদিও এর পরিকল্পনা আছে স্থানীয় পর্যায়ের টেলিকম প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে ব্যক্তি পর্যায়ের গ্রাহক আকর্ষণ করার বিষয়টিও। কারণ, একটি একক স্যাটেলাইট একসাথে কয়েক ডজন গ্রামে ব্যাকহাওল জোগান দিতে সক্ষম। মি. উইলার আশা করছেন, স্থানীয় অপারেটরেরা স্থানীয় স্কুল, গ্রামকেন্দ্র ও এমনি ধরনের স্থানে ফোন টাওয়ার বা মাস্তুল কিংবা ইন্টারনেট বেস স্টেশন নির্মাণ করতে পারবে। বেশিরভাগ প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল মাস্ট বা মোবাইল মাস্তুল চলবে সৌরবিদ্যুতে।

যদিও নিচু কক্ষপথের স্যাটেলাইট আরও উন্নত ল্যাটেন্সি দেবে, এরপরও এগুলো হবে জটিলতর। জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট থেকে ব্যতিক্রমী ভূমি থেকে তুলনামূলক কম উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া স্যাটেলাইটগুলো থেকে গোটা পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য কভারেজ দিতে প্রয়োজন হবে শত শত স্যাটেলাইট। যখন একটি স্যাটেলাইট দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যাবে, ভূমিতে থাকা রেডিও ইকুইপমেন্টগুলোর প্রয়োজন হবে দৃশ্যমান অন্য একটি স্যাটেলাইটের সাথে সংযোগ গড়ে তোলার। যেমনটি দেখা যায় মোবাইল মাস্তুল বা টাওয়ারের ক্ষেত্রে– একটি টাওয়ারের রেঞ্জের বাইরে চলে গেলে মোবাইলটি চলে যায় অন্য টাওয়ারের আওতায়। এ কাজটি সাফল্যের সাথে করার জন্য প্রয়োজন প্রচুরসংখ্যক কৌশলী সিগন্যাল প্রসেসিং– এ অভিমত মি. উইলারের। শুধু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অ্যারিয়েল ও চিপ এতটাই উন্নত হয়েছে যে, চিপ এখন এ ধরনের সিস্টেমকে সম্ভব করে তুলতে পারে। এ ক্ষেত্রে ওয়ানওয়েব সহায়তা পেয়েছে আমেরিকান প্রতিষ্ঠার কোয়ালকম (Qualcomm) থেকে। কোয়ালকম তৈরি করে মোবাইল ফোনের চিপ। এক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রয়েছে। এ খাতে যারা প্রথম বিনিয়োগ নিয়ে এগিয়ে এসেছে, কোয়ালকম তাদের মধ্যে অন্যতম।

লো-ফ্লাইং স্যাটেলাইটে মি. উইলার শুধু একাই বিনিয়োগ করছেন না। পেপ্যালের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ক্রোড়পতি এলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান এবং স্পেসএক্স মি. উইলারের মতোই একটা কিছু করতে চান। এলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রিক গাড়িরও নির্মাতা এবং তার প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে টেসলা। এলন মাস্কের স্যাটেলাইট উড়বে উইলারের স্যাটেলাইটের সমান উচ্চতায়ই, তবে তার স্যাটেলাইট হবে উইলারের স্যাটেলাইটের তুলনায় কিছুটা উন্নততর। ইন্টারনেট সংযোগ থেকে বঞ্চিতদের সংযুক্ত করা ছাড়াও এটি সার্ভ করবে আরেকটি বাজারও। এলন মাস্ক উল্লেখ করেছেন, আলো ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ভেতর দিয়ে চলার তুলনায় মহাকাশে ৪০ শতাংশ বেশি গতিতে চলে। ভূমিতে গড়ে তোলা ক্যাবল কানেকশনের তুলনায় তার লো-ফ্লাইং (নিচু কক্ষপথে উড্ডয়ন) স্যাটেলাইট আরও বেশি গতিতে বেশি দূরত্বে ডাটা সম্প্রচার করতে পারে। ফিন্যান্সিয়াল ট্রেডিং হচ্ছে সময়-কাতর তথা টাইম-সেন্সিটিভ ইনফরমেশন। এখানে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ট্রেডিংয়ে পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। এ ধরনের টাইম-সেন্সিটিভ ইনফরমেশনের জন্য এ ধরনের সেবা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। মাস্ক ও উইলার উভয়ই মনে হয় বাস্তবে এই নতুন স্যাটেলাইট ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাখেন। মি. উইলারের বিদ্যমান একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ও৩বি (O3B)। এর বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞতা রয়েছে রিমোট অপারেশনের মাধ্যমে অয়েল রিগ, ক্রুজ শিপ ও অন্যান্য বিজনেসে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা জোগানোর। ওয়ানওয়েবকে এরই মধ্যে এক ফালি মূল্যবান স্পেকট্রাম মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এটি ডাটা সম্প্রচার করে। স্পেসএক্স তা পায়নি, যদিও বাজারে গুজব আছে– এ কোম্পানি এ ক্ষেত্রেও কাজ করবে এর বদলে লেজার কমিউনিকেশনের মাধ্যমে। মি. মাস্ক টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রির একজন অভিজ্ঞ ডিজরাপ্টার। আর স্পেসএক্সের রকেট সুযোগ দেবে সস্তায় রকেট উৎক্ষেপণের। কক্ষপথে শত শত স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে এটি।

অবশ্য খরচের ব্যাপারটিও শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করবে এ ধরনের প্রকল্প সফল হবে কি না। গরিব দেশগুলোতে স্পেসএক্স ও ওয়ানওয়েবের সম্ভাবনাময় গ্রাহকেরা এদের কানেকশন পেতে খুব একটা খরচ করতে পারবে না। উভয় প্রতিষ্ঠানই বড় স্যাটেলাইটে ব্যবহারের দামি বিস্পোক ইলেকট্রনিকসের বদলে বরং সুযোগ নেবে সস্তা অব-দ্য-সেলফ-পার্টসের।

অর্থনৈতিক মাত্রাটাও হবে সহায়ক। ওয়ানওয়েব হিসাব করে দেখেছে, এদের শত শত স্যাটেলাইটের প্রতিটির খরচ পড়বে মাত্র ৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার। পুরো প্রকল্পে খরচ হবে ২০০ কোটি ডলার। মি. মাস্কের সিস্টেমে খরচ হবে ১ হাজার কোটি ডলার। স্যাটেলাইট অপারেটর হিসেবে উভয় প্রতিষ্ঠানকে প্রবল প্রতিযোগিতা করতে হবে ইন্টেলসেটের মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে, যেগুলো এখন ব্যস্ত আরও নতুন নতুন ও সম্ভাবনাময় জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে। একই সাথে রয়েছে আরও প্রতিযোগী প্রযুক্তি। ফেসবুকের কানেকটিভিটি ল্যাবের ডিরেক্টর ইয়ায়েল ম্যাগুইর মনে করেন, স্যাটেলাইটগুলো অন্তর্নিহিতভাবেই অকার্যকর– পৃথিবীর ৭০ শতাংশ এলাকা মহাসাগর। এ কারণে স্যাটেলাইটগুলো এদের উল্লেখযোগ্য উড্ডয়ন সময় কাটাবে সেই স্থানের ওপর দিয়ে উড়ে, যেখানে কেউ বসবাস করে না। আর এমনকি গরিব দেশগুলোর মধ্যে প্রথম দিকের কানেকটিভিটি তো ইতোমধ্যেই চালু আছে। বিশ্বের ৮৫ শতাংশ মানুষ কমপক্ষে দ্বিতীয় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে। এই নেটওয়ার্ক সীমিত পর্যায়ের অ্যাক্সেস সুবিধা জোগাতে পারে।

ড্রোনবহরের ব্যবহার

এ কারণেই গ্লোবাল কভারেজ দেয়ার চেষ্টার বদলে বরং ফেসবুক পরিকল্পনা করছে বিদ্যমান অবকাঠামোর সুনির্দিষ্ট গ্যাপগুলো প্লাগইন বা পূরণ করতে। এর ব্যবহার নিয়ে সংশয় থাকলেও ফেসবুক অনুসন্ধান করে দেখছে, কী করে স্যাটেলাইট ও পাশাপাশি গরিব দেশগুলোর মোবাইল অপারেটরদের সাথে মিলে স্বল্পসংখ্যক সাইটে এর ইন্টারনেট ডটঅর্গের মাধ্যমে বিনামূল্যে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দেয়া যায়। কিন্তু ফেসবুকের এই অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প হচ্ছে সৌরশক্তি ও প্রপেলারচালিত একটি ড্রোনবহরের জন্য, যেগুলো উড়ে চলবে ২০ কিলোমিটার বা এরও কিছু ওপর দিয়ে। অর্থাৎ এগুলো বাণিজ্যিক ▸

বাংলাদেশে নিখরচায় ইন্টারনেট

গত মাস থেকেই বাংলাদেশে বিনা খরচে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মোবাইল অপারেটরগুলোর অসহযোগিতার কারণে তা হয়নি। এ প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগের পাশাপাশি কাজ করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন তথা এটুআই প্রকল্প। প্রথম পর্যায়ে ফেসবুক সরকারের ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন সেবা পাওয়ার সুযোগ এতে থাকার কথা। পরে এ তালিকায় যুক্ত হবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি, যোগাযোগ, ব্যবসায়সহ স্থানীয় পর্যায়ের নানা জরুরি সেবার তথ্য। বাংলাদেশে বিনা খরচে এই ইন্টারনেট সুবিধা চালু করার পেছনে রয়েছে ফেসবুকের ইন্টারনেট ডটঅর্গ (www.internet.org) প্রকল্প। ইতোমধ্যেই এ প্রকল্প তানজানিয়া, কেনিয়া, কলম্বিয়া, ঘানা, জাম্বিয়া ও ভারতে চালু হয়েছে। সময়ের সাথে আরও কয়েকটি দেশে এ প্রকল্প চালু করা হবে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশে এ প্রকল্প চালুর ফলে কমপিউটারের পাশাপাশি মোবাইল ফোনেও বিনা খরচে এসব সেবা ব্যবহারের সুযোগ মিলবে। বাংলাদেশে এ প্রকল্পে সহায়তা করছে মোবাইল ফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান রবি।

ইন্টারনেট ডটঅর্গে লগইন করে সংশ্লিষ্ট সাইটে প্রবেশ করলে সাইটটির বিস্তারিত দেখা যাবে। এই অ্যাপটির মাধ্যমে সংবাদপত্রও পড়া যাবে। বর্তমানে বিশ্বে ২৭০ কোটি মানুষ ইন্টারনেট সেবা পায়। বিশ্বের বাকি ৫০০ কোটি মানুষকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনতে ২০১৩ সালের ২১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ইন্টারনেট ডটঅর্গ নামে এ প্রকল্প।

বিমান চলাচল লেভেলের অনেক ওপর দিয়ে চলে ভূমিতে থাকা মানুষকে ইন্টারনেট সংযোগ গড়ে তোলার সুযোগ করে দেবে। ড্রোনগুলো লেজাররশ্মি ব্যবহার করে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হবে। গ্রাউন্ড স্টেশন ও অন্যান্য বাকি ইন্টারনেটে পাঠানোর আগে ড্রোনগুলো পরস্পরের মধ্যে ডাটা রিলে করবে। প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে ব্রিটেনে উড্ডয়ন-পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছে। সেখানে ড্রোনগুলো নির্মাণ করেছে 'অ্যাসেন্টা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪ সালে ফেসবুক কিনে নিয়েছে ২ কোটি ডলারের বিনিময়ে। সৌরশক্তিচালিত হওয়ায় ড্রোনগুলো একবার উড়লে আকশে এক মাস পর্যন্ত থাকতে পারবে। এগুলো নেমে আসবে শুধু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে। এই ডাউনটাইম (যে সময়টায় একটি যন্ত্র, বিশেষ করে একটি কমপিউটার কাজের বাইরে থাকে, কিংবা বলা যায় ব্যবহারের বাইরে থাকে) আরেকটি সুযোগ করে দেয়– উপগ্রহের চেয়ে ড্রোনগুলোর উন্নয়ন সহজেই করা যায়। কারণ এগুলো প্রয়োজনে যখন ইচ্ছে নামিয়ে আনা যায়। কিন্তু উপগ্রহগুলো একবার আকাশে পাঠানো হলে, তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। এগুলো আকাশেই আটকা পড়ে যায়। যদিও ড্রোনের কভারেজের ফুটপ্রিন্ট এমনকি নিচুতর উচ্চতায় উড়ে চলা একটি উপগ্রহের তুলনায় অনেক কম। ড্রোন ওড়ে কানেকটিভিটিবঞ্চিত সুনির্দিষ্ট একটি উড্ডয়ন এলাকার ওপর দিয়ে। মি. ম্যাগুইর বলেন, উপগ্রহকে এর কক্ষপথে পাঠানোর তুলনায় বরং ড্রোন সব সময়ই কম খরচে চালু করা সম্ভব।

গুগলও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে ড্রোন নিয়ে। কিন্তু সম্ভবত এর প্রধান ধারণা, সবচেয়ে সরল। Project Loon-এর নাম। কারণ, যখন প্রথম এ ধারণাটি তুলে ধরা হয়, তখন মনে হয়েছে এটি একটি পাগলামি। ধারণাটি হচ্ছে– পৃথিবীর সাথে হিলিয়াম ভর্তি একঝাঁক বেলুনের গ্রিড গড়ে তোলা। প্রতিটি হিলিয়াম বেলুন এর সাথে বহন করবে ফেসবুকের ড্রোনের মতো সৌরশক্তিচালিত একটি তারবিহীন ট্রান্সমিটার। এই ট্রান্সমিটার অন্য বেলুন থেকে ট্রাফিক রিলে করতে সক্ষম। প্রতিযোগী কোম্পানিগুলো থেকে ব্যতিক্রমী হয়ে গুগল প্রধানত দৃষ্টি দিয়েছে মোবাইল ফোন টাওয়ার কিংবা ভূপৃষ্ঠে থাকা ওয়াই-ফাই রিলে সেন্টারগুলোতে ইন্টারনেট সরবরাহ করার। লোন বেলুনগুলো ব্যবহার করা হবে ফ্লাইং বেস স্টেশন হিসেবে, যেগুলো সরাসরি ইন্টারনেট সংযোগ দেবে ভূপৃষ্ঠের মোবাইল ফোনের সাথে। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ ধরনের বেলুন ৫০ দিন উড্ডয়নের রেকর্ড গড়ে। গুগলের সর্বশেষ মডেলের বেলুন ৬ মাস কিংবা তার চেয়েও বেশি সময় একনাগাড়ে উড়তে সক্ষম।

ফেসবুকের ড্রোনে রয়েছে ইঞ্জিন। কিন্তু গুগলের বেলুনে কোনো ইঞ্জিন নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এগুলো নিয়ন্ত্রণ বা ইচ্ছেমতো পরিচালনা করা যাবে না। এই বেলুন উড়বে বায়ুমন্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে। সেখানকার বায়ু স্ট্রাটিফায়েড বা স্তরবিন্যাসিত। বেলুনগুলো সেখানে উচ্চতা পরিবর্তন করতে পারবে। এর ফলে উচ্চতা বাড়িয়ে-কমিয়ে সেখানে বেলুনগুলোর গতি বাড়ানো বা কমানো এবং এগুলোর চলাচলের দিক পরিবর্তন করা যাবে। অবিরাম হালনাগাদ করা কমপিউটার মডেল প্রতিটি বেলুনের বিশ্বব্যাপী চলাচলের ওপর নজর রাখবে এবং নির্দেশনা দেবে এর উচ্চতা, চলার গতি ও দিক পরিবর্তন সম্পর্কে। এর কভারেজে ত্রুটি থাকবে না বললেই চলে। বায়ুর বিভিন্ন গতির সুযোগ নিয়ে বেলুনগুলো লোকবসতি নেই– এমন স্থানে উড্ডয়নের সময় কমিয়ে আনতে পারবে। আর ঘন জনবসতি এলাকায় এর গতি কমিয়ে দিতে পারবে। প্রয়োজনে বেলুনকে নিয়ে যাওয়া যাবে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের অধিকতর বেশি গতিশীল কিংবা অধিকতর কম গতিশীল বায়ুর এলাকায়।

এই প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা মাইক ক্যাসিডি

বলেন, 'এটি নিয়ে কাজ করতে আমাদের হাতে রয়েছে ৩০ বছরের বায়ুগতির তথ্য-উপাত্ত।' বেলুনগুলো নিজে নিজেই এর বায়ুর গতি পরিমাপ করতে পারবে। এর ফলে গুগলের কমপিউটারগুলোর উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং বেলুনগুলো বিশ্বব্যাপী চলাচল আরও সূচারুভাবে করতে পারবে।

একদিন গুগলের এই বেলুন আকাশে উড়বে ইন্টারনেট সংযোগ গড়তে

সবকিছুই শুনতে মহাকিছুই মনে হয়। অতি মহাকিছু বললেও ভুল হবে না। বিশেষ করে স্যাটেলাইট প্রকল্প নতুন কিছু নয়। ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে প্রযুক্তির বিস্ফোরণের সময়টায় বেশ কয়েকটি কোম্পানি অনেকটা একই ধরনের পরিকল্পনা করে, কিন্তু কারও কোনো পরিকল্পনারই কোনো ফল পাওয়া যায়নি। এরপরও ইন্টারনেট এখন বিশ্ব অর্থনীতির অনেকটা অংশ জুড়ে। আশা করা যায়, বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে বিভিন্ন সেবা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে অর্থনীতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার আরও বেড়ে যাবে।

বিধিবিধান

এসব প্রকল্পের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করবে এর রেগুলেটরি অ্যাপ্রোভাল বা বিধিবিধানগুলোর অনুমোদনের ওপর। ফেসবুককে কিছু দেশের রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রকদের সাথে আগে থেকেই একটা আপোস-মীমাংসায় পৌঁছাতে হবে, কেননা এসব দেশে ড্রোন ব্যবহারে বিধেনিষেধ আছে। আর গুগলের জন্য প্রয়োজন হবে এমন অবকাঠামো নির্মাণ করা, যেখান থেকে প্রতিদিন শত শত বেলুন আকাশে ওড়ানো ও ফিরিয়ে আনা যায়। বর্জ্য স্যাটেলাইটগুলোকে আবার যথাস্থানে নিয়ে ফেলতে হবে। যেখানে-সেখানে ফেলা যাবে না। আবার ড্রোন বা বেলুন বিধ্বস্তও হতে পারে। অতএব ঝুঁকি মোকাবেলা করার মতো নিরাপত্তার বিধিবিধানও মেনে চলতে হবে।

গুগল ও ফেসবুক ওয়েবে বেশকিছু জনপ্রিয় সাইট পরিচালনা করে। গুগল ও ফেসবুকের মতো সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে আসায় অনেকের নজর কাড়ছে। ফেসবুকের 'ইন্টারনেট ডটঅর্গ' অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীরা কোনো চার্জ ছড়াই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু মাত্র সীমিতসংখ্যক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখা যাবে। মি. ম্যাগুইর বলেন, ফেসবুক বিবেচনা করে দেখছে এর ড্রোন ডিজাইন নকল করতে দেবে কি না। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ২০১১ সালে তাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রে তা করে অগ্রসরমানের কমপিউটার সার্ভারের বেলায়।

কোম্পানিগুলো আশাবাদী, ইন্টারনেটের সম্প্রসারণে এরা সফলতা পাবে। সবগুলো কোম্পানি বলেছে, গরিব দেশের টেলিকমগুলো এ ব্যাপারে আগ্রহী। স্পেসএক্স হিসাব করে দেখেছে এর উপগ্রহগুলো প্রস্তুত হবে পাঁচ বছরের মধ্যে। ওয়ানওয়েব মনে করছে, এর ব্যবসায় শুরু হয়ে যাবে ২০১৯ সাল নাগাদ। ফেসবুক সুনির্দিষ্ট কোনো দিন-তারিখ দেয়নি। তবে শুধু বলছে, এর ড্রোন বাণিজ্যিকভাবে উড়তে শুরু করবে খুব শিগগিরই। আর গুগল আশা করছে, এরা পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক বেলুন ওড়াবে আগামী বছর। যদি এসব কোম্পানির যেকোনো একটি সফলতা পায়, তখন 'গ্লোবাল ভিলেজ' হিসেবে ইন্টারনেটের ধারণা রূপকতা ছাড়িয়ে বাস্তবতার রাজ্যে নিশ্চিভাবেই পৌঁছে যাবে কজ